লিখেছেন Administrator
বুধবার, 18 জুলাই 2012 06:12 - সর্বশেষ আপডেট বুধবার, 18 জুলাই 2012 06:28

জ্ঞানের পথে চলা নিয়ে মানুষের দুশ্চিন্তা নতুন নয়। কারণ বাঁচতে হলে যে চাই জ্ঞান-তা মানুষ বুঝে গেছে ইতিহাসপূর্ব কালেই। অথবা এভাবেও বলা যায়-পুরনো প্রস্তরযুগের শেষভাগেই মানুষ উপলব্ধি করেছে-'জ্ঞান চাই'। কারণ বাঁচতে হবে। কল্পনা করতে হবে সেই সময়টার কথা যখন মানুষ বাস করত জীবজগতের অন্যান্য প্রাণিকুলের মতোই খোলা আকাশের নিচে, অনাবৃত দেহে, উপায়-অবলম্বনহীন অবস্থায়। তার আশপাশে ছিল ঢের শক্তিশালী জীবজন্তু, যারা বিপন্ন করে তুলেছিল মানুষের জীবনযাত্রা। ওইভাবে যদি চলতে থাকত তাহলে এতদিনে এই পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা না বেড়ে কমত এবং এতদিনে তারা থাকত বিপন্ন প্রায় প্রাণিকুলের মধ্যে এক নম্বরে। আজকের যে উল্টো অবস্থা তার কারণ মানুষের জ্ঞান। যে জ্ঞান আবার বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর উপায় বদলে দেয়। যেমন সভ্যতার ঊষালগ্নে সে দেখেছিল পাহাড় থেকে ছিটকে পড়া ছোট পাথরখণ্ড বৃহদাকার বাইসন-গরু বা সিংহকে মেরে ফেলতে পারে। ধারালো ফলার ধারণা বা জ্ঞানও মানুষ অর্জন করেছে প্রকৃতির একই ধরনের লীলাখেলা থেকে।

জ্ঞানকে আয়ুধে (অস্ত্রে) রূপান্তরই ছিল মানুষের প্রাথমিক বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ। এবং মনে রাখা দরকার, যত সুসভ্যতার কথাই আমরা বলি না কেন ওই প্রক্রিয়াটা এখনও চলমান। জ্ঞানই ভোঁতা অস্ত্রে শান দেয়ার বুদ্ধি যুগিয়েছে মানুষকে, শিখিয়েছে আগুন জ্বালাতে, চাকা ঘোরাতে, পশুকে পোষ মানাতে, তাকে দিয়ে লাঙল টানাতে, নানারকম বুনো বীজ সংগ্রহ করে এনে চাষ করতে, প্যাপিরাসের পাতায় জ্ঞানের কথা লিখতে, বড় বড় সংখ্যাকে ছোট চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করতে। তালিকাটি আরও লম্বা করে বলা যায় খনিজ আহরণের কথা, তড়িৎ ধরার কথা, সেচযন্ত্র উদ্ভাবনের কথা, তাঁত চালানোর কথাও।

আসলে হিসাবের জ্ঞানের সূক্ষ্মতা এবং নির্ভুল প্রয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য আমাদেরকে ধন্যবাদ দিতে হয় আদিযুগের তাঁতিদেরকেই। কারণ প্রথম যুগের তাঁত আসলে কোনো যন্ত্র নয়। হিসাবের সূক্ষ্মতা আর আঁশ বা তন্তুগুলোকে সুবিন্যস্ত করার মরিয়া প্রক্রিয়া থেকেই মানুষ পেয়েছিল বিচিত্রময় আবরণ। 'মরিয়া' শব্দটা এজন্য বললাম-কারণ উন্নত বস্ত্র ছাড়া মানুষের চলতই না, শীত আর তাপ দুটো থেকেই রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রথমে আঁশ পরে সুতা বোনার জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিল এবং কী আশ্চর্য! প্রথম যুগের কম্পিউটারও প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছিল। আমাদের এই যুগের জ্ঞানযন্ত্র কম্পিউটার তাই মোটেই হুট করে চলে আসা কোনো যন্ত্র নয়। মানবসভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনের বিশেষ বিরাজমান সময়ে মানব মস্তিষ্কের জ্ঞানের সহযোগী হিসেবে মানুষই তৈরি করেছে কম্পিউটার, যা এখন একাধারে জ্ঞান ও যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠছে। না হয়ে যে উপায় নেই এও একরকম 'মরিয়া' প্রক্রিয়াই। কারণ প্রকৃতিতে মানুষের প্রতিকূলতা তো কম নয়। এই যে ক'দিন আগে সুপার কম্পিউটারের অগ্রগণ্য দেশ জাপানে আর্থ সিমুলেটরের মতো সুপার কম্পিউটার থাকার পরও প্রলয়ঙ্করী সুনামি হল, তার আগমনবার্তা পাওয়া গিয়েছিল মাত্র অল্প কিছুক্ষণ আগে। কাজেই জ্ঞানকে উচ্চতর পর্যায়ে তোলার আর প্রয়োজন নেই বলে যারা মনে করেন তারা ভুলই শুধু করেন না-বোকার স্বর্গে বাস করেন। উদাহরণ আরও দেয়া যায়, এই যে নানা প্রাণঘাতী জীবাণু ও রোগব্যাধি মানুষের আয়ু আর জীবনযাত্রা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তার বিরুদ্ধে কতটা জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে মানুষ? এইডস-ক্যান্সারের কথা বাদই দিলাম, ডায়াবেটিসের মতো প্রাণঘাতী রোগের কোনো নিদান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তার মানে এসব রোগ সম্পর্কে জ্ঞান সুপ্রচুর নয়।

দৈব দুর্বিপাক, মহামারী, খাদ্য স্বল্পতা, রাজনৈতিক সঙ্কট এমনকি রাস্তায় যানজটের কারণেও মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে জ্ঞানের অভাবেই। কাজেই একথা বেশ স্পষ্ট এবং জোর দিয়েই বলা যায়, জ্ঞান-প্রক্রিয়ার বাইরে থাকার চেষ্টা করা মনুষ্য-স্বভাবের বিরোধী। মানুষ এবং সভ্য মানুষ হয়ে বাঁচতে হলে জ্ঞান লাগবে এবং লাগবে আরও অনেক জ্ঞান। এ পর্যন্ত যে জ্ঞান পাওয়া গেছে বা অর্জিত হয়েছে তা মানবসভ্যতার যে উদ্দিষ্ট তার জন্য যথেষ্ট নয়। এ কথাটা পড়ে কেউ হাসতে পারেন, প্রশ্নও তুলতে পারেন যে, উদ্দিষ্টটা আসলে কী? প্রথম উদ্দিষ্ট-প্রকৃতির প্রতিকূলতা দূর করা, দ্বিতীয় উদ্দিষ্ট-খাদ্যাভাব থেকে বাঁচা, তৃতীয় উদ্দিষ্ট-রোগব্যাধি থেকে মুক্তি আর চতুর্থ উদ্দিষ্ট-সুশাসন।

এগুলোকে পুরো মানবজাতির সমস্যা বলে আমরা সহজেই এড়িয়ে যেতে পারি এবং সেটাই আমরা করছি। কাজগুলো অন্যরা করে দেবে আর আমরা রেডিমেড কাপড়ের মতো তা ব্যবহার করব এই আশাতেই রয়ে গেছেন অনেকে। কিন্তু আমাদের নিজ পরিবেশকে রক্ষা করবে কে? আমাদের খাদ্যাভাব মোকাবেলায় কে এগিয়ে আসবে জাহাজভর্তি খাদ্যশস্য নিয়ে? আর শুধু শস্যজাতীয় খাদ্য দিয়ে তো সব সমস্যা মেটে না-একটু পুষ্টি আর মেদেরও তো প্রয়োজন আছে। আর রোগব্যাধি? দেশের স্বাস্থ্যসেবার চিত্রটা এখানে আর নতুন করে তোলার প্রয়োজন দেখি না। এখন দেশের ভেতরে টাকা খরচ করেও চিকিৎসা সেবা পাওয়া যাচ্ছে না। টেলিমেডিসিন সেবা প্রচলন হতে হতেও কোথায় যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে অনেকে পিসি, অনেকে মোবাইল সেট বিক্রি হলেও এর মাধ্যমে কার্যকর সেটগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো

লিখেছেন Administrator
বুধবার, 18 জুলাই 2012 06:12 - সর্বশেষ আপডেট বুধবার, 18 জুলাই 2012 06:28

যাচ্ছে প্রযুক্তির ভীতি আর ভাষার সমস্যার কারণে। সর্বোপরি যারা এই সেবা দেবেন তাদের সদিচ্ছা এবং ত্যাগী মনোভাব প্রয়োজন; প্রয়োজন তাদেরও কিছু কারিগরি জ্ঞান, যা দিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেদের মতো করে সমস্যা মোকাবেলা করতে পারেন।

আর সুশাসনের বিষয়টার সঙ্গে আইসিটির যোগসূত্রের কথা যদি বলতে চাই, তাহলে সেও এক সাতকাহন হবে। এটুকু এখানে বলে রাখি, আইসিটির জ্ঞানের ভাণ্ডারে গণতন্ত্র-সুশাসন প্রক্রিয়ার বিষয়ে এত বেশি পরিমাণ কনটেন্ট আছে, যাকে অসীমের কাছাকাছি বলাও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু আমাদের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তাব্যক্তিরা আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সেগুলো পড়েন বা আত্মস্থ করেন বলে তো মনে হয় না। এক উইকিপিডিয়াতে যত তথ্য আছে তা দিয়েই বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা স্বশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেন, কিন্তু সে কাজ তারা করবেন বলে তো মনে হয় না। এখানেও সমস্যা ইংরেজি ভাষা এবং প্রযুক্তিকে ভয় পাওয়া। তবে এ কথাটাও বলে রাখি-যতদিন রাজনীতিবিদরা আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষা না নেবেন, ততদিন আমাদের চলমান সমস্যাগুলোর সমাধান হবে না-চলতে থাকবে জীবনের অপচয়।

একটু লক্ষ করুন, বুঝবেন-আপাতদৃষ্টিতে গাড়ি-বাড়ি, শপিং মল, সংবিধান-সংসদ, হাসপাতাল-ওষুধপত্র নিয়ে জীবনকে যত স্বস্তিকর মনে হচ্ছে; আদতে অবস্থাটা তেমন নয়। না, ভয় দেখানোর কথা নয়, রূঢ় বাস্তবতা হলো-বন্যপ্রাণী আর শীত-আতপ থেকে বাঁচার কিছু কৌশল আয়ত্ত করা গেছে মাত্র হাজার দশেক বছরের পথচলায়-এখনও অনেকটা পথ বাকি। অর্থাৎ আরও জ্ঞান অর্জন করতে হবে, আরও বুদ্ধি খাটাতে হবে।

এই যে আজকাল জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কথা বলা হয় সেটা কেন? কারণ হচ্ছে পেশিশক্তি আর অর্থবিত্ত দিয়ে ওই চতুর্দদিষ্ট অর্জন সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা শান্তি-স্বস্তি নিয়ে। এ পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে চিন্তাভাবনা হয়নি বা হচ্ছে না তা তো নয়। যখন কম্পিউটার উদ্ভাবনের সম্ভাবনা গণিতবিদরা জাগিয়ে তুলছিলেন তখনই তারা বলছিলেন সবকিছুকে সমন্বয় করতে হলে চাই সঠিক তথ্য-'স্বর্ণ আনুপাতিক তথ্য' অর্থাৎ নির্ভুল ও সূক্ষ্ম হওয়া চাই। আর একটা প্রত্যয় ছিল-সবার কাছে কম্পিউটার বা গাণিতিক টার্মিনাল থাকা চাই। কিন্তু তা গান শোনা বা সিনেমা দেখার জন্য নয়, সঠিক ও সূক্ষ্ম তথ্য সময়মতো দেয়া-নেয়ার জন্য।

একবিংশ শতাব্দীর এই পর্যায়ে প্রযুক্তির অনেক উন্নতি যে হয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তথ্য দেয়া-নেয়া এবং জ্ঞানকে উন্নত করতে তার ব্যবহার করার বিষয়টা এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে অনেকটাই প্রাথমিক পর্যায়ে। এ যেন অনেকটা নতুন প্রস্তর যুগের মানবকুলের মতো সুবিধামতো প্রস্তরখণ্ড পেয়েছে হাতে, কিন্তু বুঝতে পারছে না কোন দিকটা ধারালো করা যাবে সহজে। আর যতক্ষণ না তা ধারালো হচ্ছে ততক্ষণ তা থেকে যাবে খেলনা।

আমাদের মতো দেশে সমস্যা হচ্ছে-নিজেদের উদ্ভাসিত প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করছি না, ফলে অনেকেরই ধারণা জন্মেছে একটা কিছু পশ্চিমারা করে দেবেই। এখন আর এর সঙ্গে চীনাদের নামও যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তারা যে উদ্ভাবনগুলো করেছে বা করছে তা কিসের জন্য? প্রথমত : কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ইতিহাসটাই দেখুন-যুদ্ধজয়ের স্বার্থে যা পরবর্তীতে বাণিজ্যিক স্বার্থে পর্যবসিত হয়েছে। ওরা ওদের ভাষায় অযুত-নিযুত তথ্য দিয়ে জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি করছে কিন্তু আমরা কী করছি?

অনেকেই এদেশে এখনও ভাবেন আচিরেই পশ্চিমারা আমাদের ভাষায় জ্ঞানভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করে দেবে। বলতে চাই না যে কিছু তারা করছে না বা করেনি। যতটুকু তারা করেছে তা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থেই করেছে। কিন্তু বাকিটুকু যে আমাদের করতে হবে! আমাদের তথ্য তো আমরা ছাড়া কেউ ভালো জানবে না। সবচেয়ে কষ্টকর বা দুঃখজনক হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটগুলো। সময়মতো আপডেট হয় না। একে তো ন্যাশনাল ডাটাবেজ নেই, তথ্যগুলোকে জ্ঞানে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটাও শুরু হয়নি। তারপরও যেটুকু আছে সেটুকুর প্রতি না আছে মমতা না আছে নজরদারি। এমন ছোট একটা দেশে উপজেলা-ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দেয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়, বিষয়টা টেলিডেনসিটি দিয়ে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু কাজের তথ্যের ব্যবহার বা দেয়া-নেয়াটাই এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। থ্রিজি নিয়ে একটা বিতর্ক চলছে। অনেকে মনে করছেন সরকার থ্রিজি লাইসেন্স দিয়ে দিলে এ সমস্যার সমাধান অনেকটাই হয়ে যাবে। কিন্তু এটাও তো লক্ষ রাখতে হবে, থ্রিজি কী কী সুবিধা দেবে এবং সে সুবিধাগুলো ভোগ করার সঙ্গতি মানুষের আছে কি না অথবা সেগুলো ব্যবহার করে তারা লাভবান হবে কি না? এ আশঙ্কার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে এবং পাশের দেশে নতুন যে প্রযুক্তিই আসছে তার বিনোদন মূল্য এবং 'ফালতু কথার' বিজ্ঞাপনই বেশি প্রচার করা হচ্ছে। ভারত যা করছে আমাদেরও তাই করতে হবে বা ওই ধরনের প্রযুক্তি-সুবিধা দিতে হবে এরকম একটা অভিমান অনেকের মধ্যেই আছে।

একসময় হয়ত বাস্তব অবস্থাটা ওরকম ছিল অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের যোগাযোগ, বাজার সম্প্রসারণ ইত্যাদিতে আমাদের পশ্চাৎপদতা ছিল। কিন্তু এখন অবস্থাটা দু'বছর আগের মতোও নেই। এখানে অভাবনীয় মাত্রায় টেলিডেনসিটি বেড়েছে, কিন্তু ইন্টারনেট এক্সেসে বাড়েনি। অর্থাৎ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও জ্ঞানভিত্তিক সুবিধা সরকারি-বেসরকারি কোনো তরফ থেকেই হয়নি। এক্ষেত্রে প্রধান বাধা সম্ভবত ভাষা এবং তথ্যভাণ্ডার। মানুষ ভাষার বাধার কারণে

লিখেছেন Administrator
বুধবার, 18 জুলাই 2012 06:12 - সর্বশেষ আপডেট বুধবার, 18 জুলাই 2012 06:28

উপযোগিতা বুঝতে পারছে না। এখন মফস্বল শহর বা বিদ্যুৎ আছে এমন গ্রামের সচ্ছল অনেক পরিবারে কম্পিউটারের দেখা মেলে, কিন্তু সে কম্পিউটার ব্যবহার হয় সিনেমা দেখতে এবং গান শুনতে। রাজধানীরও বেশিরভাগ উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়ে ইংরেজি-বাংলা টাইপও করতে পারে না, কিন্তু কোথাও চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে উইন্ডোজ ব্যবহারের সক্ষমতা উল্লেখ করে। কিন্তু ওই সক্ষমতা দিয়ে তারা গান বাজানো, সিনেমা দেখা ছাড়া বড়জোর ফেসবুক ওপেন করতে পারে। এমনকি মেইল ব্যবহারও করে না, ইংরেজি জানে না বলে ব্রাউজও করে না ওই ইংরেজির ভয়ে। এই পরিস্থিতিতে বিনোদন-সুবিধা আরও বাড়লে হয়ত পিসি বিক্রি, সেবা-বাণিজ্য আরও কিছুটা বাড়বে, কিন্তু তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, জ্ঞানচর্চা বাড়বে-এমন ধারণা করা বোধহয় ঠিক হবে না।

এখন বরং বাণিজ্যিক সুবিধাভোগীদের আরও সুবিধা দেয়ার চেষ্টার বদলে সরকারি-বেসরকারি সব মহল থেকেই বাংলা ভাষার ব্যবহার ইংরেজি ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য আনা এবং ওপেন সোর্স ব্যবহারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সরকারি উদ্যোগ এখন খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। এটা একেবারে অভিনব ব্যাপার তা নয়, বহুদিন আগে থেকেই দেশে এ বিষয়ে আন্দোলনমুখী একটা উদ্যোগ লক্ষণীয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কিছু ব্যক্তিকে আন্দোলনকারী হিসেবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে মাত্র অথচ তাদেরকে যুক্তিসঙ্গত সহযোগিতা-পৃষ্ঠপোষকতা কিছুই প্রায় করা হয়নি। ফলে তৃণমূল পর্যন্ত আন্দোলনটা পৌঁছতে পারেনি। এ বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে রাজনীতিবিদদেরও, কারণ তারাও এই সমস্যার মধ্যে আছেন।

আমরা যদি ভবিষ্যতের চিত্রটা একটু আঁচ করতে চেষ্টা করি, তাহলে দেখব আর কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের দেশেও হ্যান্ডটার্মিনালের বাজার বাড়বে। থ্রিজি গবেষকেরা এক সময় আসবেই এবং তা মোবাইলের মতো সেটেই ব্যবহার হবে, কিন্তু ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য না এলে এবং যোগাযোগের উপযোগিতা তৈরি না হলে প্রকৃত তথ্য দেয়া-নেয়া হবে না, তথ্যগুলো প্রক্রিয়াজাত বা জ্ঞান উদ্রেককারী হয়ে উঠবে না।

গত কয়েক বছরের সরকারি পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, আইসিটি ব্যবহারে অগ্রগণ্য অবস্থায় চলে গেছে আর্থিক খাত, বিশেষত ব্যাংকিং ও শুল্ক আদায় ব্যবস্থা। এটা অনেকটাই আন্তর্জাতিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য হয়েছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে শিক্ষা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে সময়মাত্রিক ব্যবহার শুরু করা যায়নি। আর এ কারণেই পশ্চাৎপদতা, দারিদ্র্য, পরিবেশ বিপর্যয়-কোনো ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসেনি। আর বর্তমান বিশ্বে এ বিষয়গুলো একান্তভাবেই তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রমে পরিণত করছে। জ্ঞান-প্রক্রিয়ার বাইরে থাকা মানুষ অল্প আঘাতেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছে। কারণ আধুনিক সঙ্কট মোকাবেলার কৌশল তার আয়ত্তে নেই।

আসলে এই কৌশলটাই তাদের শেখাতে হবে এবং সেটা কম্পিউটার লিটারেসির মাধ্যমে। শিক্ষা সম্প্রসারণের আবশ্যিক অনুষদ অবশ্যই হতে হবে আইসিটি। আর এটা করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াটাও এখনই শুরু করে দিতে হবে। পথচলা যে আমাদের অনেকটাই বাকি রয়ে গেছে তা বলাই বাহুল্য...তবে পথে আমরা নেমেছি-পাথেয়ও কিছু আছে, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে হলে চলতে চলতেই কিছু অর্জন করতে হবে।

লেখক : সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব